দৈনিক ইনকিলাব

18

তারিখ ... 15 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

প্রসঙ্গ ঃ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা

মেজর আছাদুজ্জামান (অবঃ)

মহা আড়ম্বরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ পালিত হলো। পোস্টার, প্লাকার্ড ও নানা রং-এর ফেস্টুনে বা ব্যানারে শিক্ষা অফিসগুলো ভরে উঠেছিল। সাথে সাথে লাখ লাখ টাকা খরচ করে সেমিনার ও সম্মেলন ও বসছিল। এসব সেমিনার বা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ (আমলাদের নিকট) বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য দিন-রাত্রি গলধঘর্ম হয়ে উঠছিল। বড় বড় আমলাদের সাথে পোটি আমলারাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কত আকর্ষণীয় করে তোলা যায় রাজনীতিবিদদের নিকট এবং তাতেই প্রমোশন ও পয়সার দিক দিয়ে লোভনীয় পোস্টিংগুলো যেন হাতিয়ে নেয়া যায়। তারপর শিক্ষা সপ্তাহ শেষ যেমনই হয়ে যাবে আর অমনি সমস্ত তৎপরতা ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে আগামী এক বৎসরের মতো। যাদের উদ্দেশ্যে অথবা লক্ষ্য করে এই শিক্ষাপক্ষ বা সপ্তাহ সেই গ্রামের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ও বঞ্চিত মানব সন্তানদের জন্য, তারা কি এই তৎপরতার সাথে আদৌ যুক্ত অথবা ওয়াকিবহাল? অত শত বুঝার উপাইও তাদের নেই বা আগ্রহও কম। তাহলে কেন এই আয়োজন? এই লক্ষ নিয়ে এই সকল কর্মকান্ড।

বাংলাদেশের এখনও শতকরা ৮০% ভাগ মানুষ নিরক্ষর, এখনও ৫০ লক্ষ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরাপুরি বঞ্চিত। ২ কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময়োপযোগী শিশুর ভিতর ১ কোটি শিশু কোনো রকমে পরিচালিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। এই বিদ্যালয়গুলোতেই (যেগুলো গ্রামে অবস্থিত) অধিকাংশেই শিক্ষার পরিবেশ বলতে যেটা বুঝাই তা অনুপস্থিত। তাহলে কেন সপ্তাহ/পক্ষ পালন প্রত্যেক বৎসর ঘটা করে।

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা যেসব সমস্যায় জর্জরিত সেগুলোর কিছুটা বিশ্লেষণ করা গেল।

১। একটি উন্নয়নশীল দেশে যে পরিমাণ বাজেট প্রাথমিক শিক্ষার পেছনে ব্যয় করা দরকার তা এই দেশে কখনোই হয় না। শতকরা ৫-৭ ভাগ উন্নয়ন বাজেট উন্নত দেশে বা উন্নয়নশীল দেশে ব্যয় হয়ে থাকে, সেখানে আমাদের দেশে ০.৩১ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ থাকে। এই সামান্য অর্থ দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয় চালানো সম্ভব? সুষ্ঠু শিক্ষাজীবন কি নিশ্চিত করা যায়?

২। বাজেটের সিংহভাগ (যেটা ব্যয়ের জন্য ধরা হয়) চলে যায় এক শ্রেণীর সরকারী আমলাদের দুর্নীতির মাধ্যমে পকেটে পকেটে। সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় এখন তা শোনা যায় না। অধিকাংশ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার বা জেলা শিক্ষা অফিসার যাদের দায়িত্ব স্কুল পরিদর্শন ও শিক্ষক/শিক্ষিকারা সঠিকভাবে শিক্ষা দিচ্ছে কি না এবং ছাত্রদের স্কুলে উপস্থিত করাতে পারছে কি না বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অসুবিধাগুলো দূর করা– তারা তা সঠিকভাবে পালন করে না। ঘটনাক্রমে কোন অজোগ্রামে স্কুলে গেলেও ঠিক রিপোর্ট লেখে না যদি মূলা, কলা বা নগদ কিছু মিলে যায়। দেখা যায় গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিকাংশ আমলা পরিদর্শনে যায় না। শিক্ষক/শিক্ষিকারা ঐ গ্রামের বাসিন্দা হওয়াই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলে পাঠদান না করে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাস শেষে বিল বানিয়ে থানা শিক্ষা অফিসারকে কিছু নগদ ঢেলে বেতন/ভাতা তুলে নিয়ে যায়। অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বাস্তবে যাদের অস্তিত্ব নেই কিন্তু ভাতার টাকা ঠিকই উত্তোলন করা হচ্ছে।

৩। শিক্ষক নিয়োগে মোটেই কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মানা হয় না। কানুন হয়তো আছে খাতা-কলমে কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য লোকও চাকরি পেয়ে যায়। যার দরুন শিক্ষার মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লোকাল স্কুল কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে যাকে যেখানে কোনরূপ যোগ্যতা দেখা হয় না। শুধু একটি সার্টিফিকেট থাকলেই চলে। এদের শিক্ষার মান নিম্নমানের।

৪। টেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যা অতি অল্প যার দরুন এরা অধিকাংশই জানে না কিভাবে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায়।

৫। শিশুদের সংখ্যার তুলনায় স্কুলের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আনুপাতিক হারে অনেক তফাৎ। উন্নত দেশে যেখানে ২০ঃ১ সেখানে আমাদের দেশে ৬৯ঃ১ জন। সুতরাং একজন শিক্ষকের পক্ষে এতগুলো বাচ্চা সামাল দেওয়া মোটেই সম্ভবপর হয় না।

৬। শিক্ষার উপকরণ যেমন- বই, খাতা, পেন্সিল, চক, ডাস্টার; ব্লাক বোর্ড, চেয়ার-টেবিল এবং বেঞ্চি নিতান্তই অপ্রতুল। যদিও বা বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার কথা (বিদেশী অনুদানে) তবু সরকারী আমলারা বিনামূল্যে বিতরণ করে না। এক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল ঘর নেই জরাজীর্ণ কাঁচাঘরে ক্লাস চলে, একটু বৃষ্টি হলে স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

৭। দুই কোটি শিক্ষার্থীর জন্য ৫৪,০০০ হাজার স্কুল প্রাথমিক যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এখনও ২০ হাজার গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই আরও ১ লক্ষ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা দরকার যদি সমুদয় ছেলে-মেয়েদের স্কুলের ভিতর আনতে হয়। যদি শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হয় এবং জাতিকে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হয় তবে উপরের বর্ণিত সমস্যাগুলো দূর করা ছাড়াও নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য ঃ

১। অনতিবিলম্বে শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে যেটা জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% ভাগের কম হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি অবশ্যই দূর করতে হবে। কিছুদিন পূর্বে ইউনিসেফের এক সমীক্ষায় দেখানো হয় যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দের ৬৩% ভাগ টাকা অপচয় হয়। এই অপচয় অবশ্যই রোধ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

২। আরও নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়োগ ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী ও নিষ্ঠাবান সদস্য সুষ্ঠু নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। এদের জন্য অবশ্যই লোভনীয় বেতন-ভাতা বা অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিতরা এ পেশায় আসতে কখনোই আগ্রহ পাবে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য চাপ দূরীভূত করতে হবে। স্কুল রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে উন্নত দেশের মতো শিক্ষক/শিক্ষিকা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা চালু করা দরকার, তাহলে শিক্ষকের মান উন্নত হবে। সাথে সাথে শিক্ষার মানও বাড়বে।

৩। বিগত সরকার কর্তৃক চালুকৃত 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' ব্যবস্থা অবশ্যই চালু রাখা প্রয়োজন যদিও তারা দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছিল তথাপিও উদ্যোগটা অতি প্রশংসনীয়। কারণ গ্রামের গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরা সংসারের অভাব দূর করার নিমিত্তে ছোট বেলা থেকে উপার্জনে লেগে যায়। যার দরুন স্কুলে যাবার উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে এবং বাবা মায়েরা স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে ক্ষেতে খামারে বা বাসার কাজে পাঠায়।

৪। প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন জাতের স্কুল বা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একই ধরনের ও একই সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা চালু করতে হবে।

একজন ক্যাডেট কলেজের ছাত্রের পিছনে সরকারের প্রতি বৎসর ব্যয় হয় প্রায় ৪০ হাজার টাকার উপর সেখানে গ্রামের স্কুলের একজন ছাত্রের পেছনে ব্যয় হয় ২৫২ টাকা থেকে ৫৩২ টাকা। এই বৈষম্য অবশ্যই কাম্য নয়। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতার বিরাট ব্যবধান দূর করতে হবে। সরকারী শিক্ষকরা পান গড়ে ২৫০০ টাকা, বেসরকারী শিক্ষকরা পান ৫২৫ টাকা। ফলে বেসরকারী শিক্ষক/শিক্ষিকরা কাজ করার মনোভাব হারিয়ে ফেলেন। গরীব ছেলে মেয়েদের জন্য এসএসসি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বই, খাতা, কলম নিখরচাই প্রদান করা অপরিহার্য। সর্বশেষ সবার জন্য শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হলে আইনকে শক্তভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আইন ভঙ্গকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। তবেই অভিভাবকরা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিবে।

গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার যে গগণচুম্বি পার্থক্য তা অবশ্যই দূরীভূত করা একান্ত দরকার। সর্বোপরি শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

সরকারী ও বিরোধী দলসমূহের জাতীয় স্বার্থ চিন্তাকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে, তবেই জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যাবে।